# প্রাসঙ্গিক

আমাদের মনের খোলে সংগীতের প্রভাব অনেকখানি। শিশুবয়েস থেকেই। দুরন্ত মায়ের কোলে শুয়ে দুধ খেতে না চাইলে, তার হাত-পা আবদ্ধ করে মা ঝিনুক দ্বারা বাটিতে আঘাত করে মৃদু শব্দ তোলে, সেই শব্দের অনুরণন শিশুমনকে আকৃষ্ট করে— সুর ও শব্দ আচ্ছন্ন করে তার ছটফটে মনকে। একথা শুধু মানবশিশুর ক্ষেত্রেই নয় সমগ্র জীবজগতের ওপর প্রয়োগ-প্রযোজ্য। ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ সাহেবের নাকি বাড়িতে তিনটে সাপ ছাড়া থাকত, বাংলাদেশে যাদের 'পানস' বলে। খাঁ সাহেব যখন বাজাতেন তখন তারা চুপ করে থাকত; বাজনা শেষে চলে যেত।

বিশ্বজগৎ সংগীতময়। আকাশ-বাতাস-পাহাড়-নদী-পাখি-কাকলি সুরে বাঁধা। আর বাংলার তো প্রাণে প্রাণে গান। অবশ্য এদেশে একসময় ধ্রুপদি সংগীতকেই অধিক প্রাধান্য দেওয়া হত। তালিম-নেওয়া সুরসাধকেরই গানের গুরুত্ব ছিল। গুরু বা ওস্তাদের নাড়াবেঁধে তাঁরা উচ্চাঙ্গ সংগীতের তালেবর হয়ে উঠতেন। তখনকার দিনে ঘরানা সংগীত পরিবারের সনাতন প্রথা ছিল। গুরু যতদিন না উপযুক্ত দান করতেন ততদিন শিষ্য প্রকাশ্যসভায় বা জলসায় গাইবার জাহির করবার অনুমতি পেতেন না। আলাউদ্দিন খাঁ গুরুর বারণ আছে তাই শুক্রবার বাদ্যযন্ত্রে হাত দিতেন না। গলায় সা রে গা মা শুদ্ধ ওঠেনি বা যন্ত্রের অঙ্গুলিচালনা হয়নি এমন সংগীতকে ধর্তব্যেই আনা হত না। এ ছিল রাগরাগিণীর দেশ। শুধুমাত্র দক্ষিণ ভারতেই বাহাত্তর রকমের ঠাঁট প্রচলিত ছিল। ধীরে ধীরে অবশ্য— ব্রিটিশরা এ দেশে আসার পর— পাশ্চাত্য সংগীতের প্রভাব পড়ে এদেশের সংগীতে। তাছাড়া উচ্চাঙ্গ সংগীত বা শাস্ত্রীয় সংগীত ছিল মুষ্টিমেয়র মধ্যে সীমাবদ্ধ। সংগীতশিল্পী সুনীল বসুর কথায়— সংগীত সম্পর্কেই আমার প্রথম কথা হল— বুদ্ধি, কণ্ঠস্বর এবং বোধি বা অনুভূতির সার্থক সাযুজ্যের আনন্দ ফলশ্রুতিই হল ভালো গান। অর্থাৎ ভালো গানমাত্রই শুধু ধ্রুপদি সংগীত নয়, আবার চটুলতা সর্বস্বও নয়, চটুলতা অতিক্রম করেও একসময় যেন সেই গান হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে, কানকে শুধু নয় হৃদয়কে নাড়া দেয়; কেন না কান তো হৃদয়ের দরজা।

সংগীতশিল্পী সুনীল বসুর কথাতেই : আর উচ্চাঙ্গ সংগীত জনপ্রিয় না হবার প্রথম ও প্রধান কারণ হচ্ছে— উচ্চাঙ্গ সংগীতের বেশিরভাগ শিল্পীই সংগীতের রস-মাধুর্যের প্রতি নজর না দিয়ে ব্যাকরণ নিয়েই মত্ত থাকেন। এবং সেজন্যে তাঁদের সংগীত রস সৃষ্টিতে কম সক্ষম! আর সেখান থেকেই বোধহয় রাগপ্রধান গান থেকে আধুনিক বাংলা গানের সূত্রপাত।

যদিও তখনও টেলিভিশন আসেনি। এবং এই লেখাগুলি সেই সময়কার। যদিও এখানে ধ্রুপদি ঘরানা এবং আধুনিক ঘরানার উভয় সম্প্রদায়ের শিল্পীদেরই ধরা হয়েছে। যাইহোক, তখন রেডিয়ো এবং রেকর্ডই ছিল জনজীবনে গান পৌঁছে দেওয়ার অন্যতম মাধ্যম। গানের

আসর কিংবা জলসা যদিও ছিল; কিন্তু সেখানে শ্রোতার সংখ্যা সীমাবদ্ধ। তাই রেডিয়ো এবং রেকর্ডই ছিল তৎকালে অধিকসংখ্যক শ্রোতৃজীবনে পৌঁছে যাওয়ার একমাত্র রাস্তা।

এই সংকলনে উল্লেখিত সংগীত শিল্পীদের জীবনচর্যা 'মাসিক বসুমতী', পৌষ ১৩৬১ বঙ্গাব্দ থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হয়। তৎসময়ে উক্ত শিল্পীরাও ছিলেন খ্যাতির মধ্যগগনে। এদেশের শ্রোতাদের কাছে তাঁদের কদর ছিল আকাশছোঁয়া। তাঁদের হাত ধরেই বাংলায় আধুনিক গানের সূত্রপাত এবং বিকাশ। আবার যুগক্রমে সেই আধুনিক সংগীতের চটুলসর্বস্বতায় তাঁদের হারিয়ে যাওয়া, স্মৃতির অতলে তলিয়ে যাওয়া। আজও তাঁদের গান শুনতে পাই, মোহিত হই অথচ বহুলাংশে সংগীতশিল্পীদের নাম জানি না!

সেখানেই বসুমতী পত্রিকার কৃতিত্ব। সেসময় এমন তাবৎ শিল্পীদের অল্পবিস্তর জীবনাখ্যান ধরে রেখে অন্তত তাঁদের জীবন সম্পর্কে যৎসামান্য আলো ফুটিয়ে রাখতে পেরেছে। আর তার মূল্য অপরিসীম। এই লেখাগুলি না থাকলে আমরা হয়তো জানতেই পারতাম না কত ক্ষণজন্মা সংগীতসাধকের জীবনীকথা। কী পরিমাণ তাঁদের ব্যাপ্তি যশ আলোকছটা। এই লেখাগুলি থেকেই জানতে পারছি, সুগায়ক গোপাল দাশগুপ্ত চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ইংরেজ সরকারের সন্দেহভাজন ব্যক্তি হিসেবে থানা, হাজত, গৃহন্তরীণ ইত্যাদির ভুক্তভোগী। আর এক সংগীতশিল্পী অনিল বাগচী সুভাষচন্দ্র বসুর জাতীয় মহাবিদ্যালয়ে সংগীত পরিবেশন করেন ও নানাবিধ পুলিশ অত্যাচার সহ্য করতে হয় তাঁকে। 'সবুজ সংঘ' নামক এক সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানের তিনি ছিলেন প্রাণ। নেতাজি ছিলেন তার সভাপতি। আর একজন নৃত্যশিল্পী শ্রীপ্রহ্লাদ দাসও অসহযোগ আন্দোলনের সময় কারাবরণ করেন এবং পিকেটিং-এর দরুন ব্রিটিশ পুলিশ কর্তৃক প্রচণ্ড প্রহৃত হন। এখানে বলে রাখি, এই সংকলনে সংগীত শিল্পীদের পাশাপাশি তিনজন নৃত্য বিশারদের আলাপচারিতাও লিপিবদ্ধ। তাঁরা হলেন— উদয়শংকর, শান্তিদেব ঘোষ ও প্রহ্লাদ দাস।

লেখাগুলির মধ্যে দিয়ে এও জানতে পারছি, সংগীত ক্রমশ আধুনিক হয়ে উঠছে; নিত্যনতুন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার, যন্ত্রের আবিষ্কার চোখে পড়ছে। বাদ্যযন্ত্র নিয়ে নানা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে, বাদ্যযন্ত্রে বৈদ্যুতিন প্রয়োগ দেখা যাচ্ছে। একসময় যাঁরা সংগীতের ধ্রুপদ অবস্থান নিয়ে অনড় ছিলেন দেখা গেল তাঁরা সংলিপ্ত হচ্ছেন নিত্যনতুন সুর যন্ত্রের ব্যবহার-নৈপুণ্যে। আলেখ্যগুলি থেকে পাচ্ছি, আলাউদ্দিন খাঁ সাহেব নাকি কিছুকাল ক্লারিওনেট শেখেন স্বামী বিবেকানন্দের এক জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাবু দত্তের নিকট। আবার খ্যাতনামা সংগীতশিল্পী দক্ষিণামোহন ঠাকুর প্রথম বৈদ্যুতিক সেতার আবিষ্কার করেন; এ-কাজে তার সহায়ক ছিলেন রেডিয়ো সাপ্লাই স্টোর্সের জ্যোতিপ্রকাশ-জ্ঞানপ্রকাশ-চারুপ্রকাশ ঘোষ প্রমুখ।

উক্ত সংগীতশিল্পীরা শুধুমাত্র গায়নের মধ্য দিয়ে নিজেদের সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাঁদের মধ্যে অধিকজনই একাধারে ছিলেন গীতিকার ও সুরকার, চলচ্চিত্রে সুরযোজনা করেছেন, আবহসংগীত রচনা করেছেন। আবার কেউ কেউ ছিলেন সুলেখকও। সংগীতবিশারদ

শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় 'গীতমালা', 'তানমালা', 'গীতদর্পণ' ইত্যাদি সংগীত বিষয়ক বইয়ের প্রণেতা। 'ভারতীয় সংগীতের ইতিহাস' তাঁরই বিরচিত। আবার বিশেষ গুণসম্পন্নও ছিলেন কেউ কেউ। সংগীতশিল্পী সত্যজিৎ মজুমদার প্রারম্ভিক জীবনে ইস্টবেঙ্গল ক্লাবে ফুটবল খেলতেন। সুগায়ক সত্য চৌধুরী বেশ ভালো এরোপ্লেন চালাতে ও ছবি তুলতে পারঙ্গম। কারও কারও ছিল আবার বিশেষ দক্ষতা। শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় গৃহে কখনও রেওয়াজ করতেন না— সরাসরি আসরে গাইতেন। বিশেষত শ্যামল মিত্র, এছাড়াও সুধীরলাল চক্রবর্তী, জ্ঞান গোস্বামী, কৃষ্ণচন্দ্র দে, পঙ্কজ মল্লিক, দিলীপকুমার রায় প্রমুখ সংগীতজ্ঞজন নাকি মাইক ছাড়াও আসরে সংগীত পরিবেশনে সক্ষম ছিলেন। আবার রাইচাঁদ বড়াল এদেশে প্রথম কার্টুন ছবির উদ্যোক্তা। ছবিটির নাম P. Brothers in on moonlight Night। ছবিটি মুক্তি পেয়েছিল ১৯৩৪ সালের ২৩ শে জুন। যেমন অন্ধগায়ক কৃষ্ণচন্দ্র দে 'রঙমহল' রঙ্গমঞ্চের প্রতিষ্ঠাতা। কৃষ্ণচন্দ্র দে-ই কলকাতা বেতারকেন্দ্রের সূচনার দিন থেকে দ্বিতীয় ব্যক্তি হিসেবে একখানা উচ্চাঙ্গ সংগীত শুনিয়েছিলেন। আর উদ্বোধক সংগীতশিল্পী হলেন দিনুঠাকুর (দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর), রবীন্দ্রজীবনী (তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩০৩)-তে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় ১৯৩১-এর গীতোৎসব অভিনয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন— 'এবারকার এই নৃত্যভিনয়ে কথাকলি নাচের প্রবর্ত্তন করেন শান্তিদেব।' শান্তিনিকেতনের নৃত্যধারায় কথাকলির প্রচলন নৃত্যশিল্পী ও রবীন্দ্র সংগীতকার শান্তিদেব ঘোষের হাতেই।

এ তো গেল ব্যক্তিকথা— প্রতিষ্ঠানকথাও এই লেখাগুলির আরো এক উজ্জ্বল দিক। ১৯২৭ সালে সদ্যোজাত শিশুর মতো পৃথিবীর আলো সবে দেখেছে ইন্ডিয়ান স্টেট ব্রডকাস্টিং কর্পোরেশন; পরবর্তীকালে যার নাম অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো। ১৯২৮ সালে কলকাতা বেতারকেন্দ্র থেকে প্রথম বৈঠকিসংগীত পরিবেশন করেন সংগীতজ্ঞ রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়। পরবর্তীকালে ১৯৫৭ সালে নামকরণ হয় 'আকাশবাণী'। আলেখ্যগুলি থেকে তৎপূর্বের বেশ কয়েকটি রেডিয়ো প্রোগ্রামের নামোল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন রবিবার সংগীত শিক্ষার আসর, ১৯৫৪ সালের সেপ্টেম্বরে সম্প্রচারিত সুরসভা, 'ঝংকার' সংগীতচক্র প্রভৃতি উল্লেখিত। তাছাড়া উক্ত বিষয়টিতে বিভিন্ন রেকর্ড কোম্পানির নাম: এইচএমভি, মেগাফোন, গ্রামোফোন রেকর্ড, হিন্দুস্তান, কলম্বিয়া, বোম্বের ব্রডকাস্টিং রেকর্ড কোম্পানি, ওরিয়েন্টাল মিউজিক্যাল ভ্যারাইটিস লিমিটেড, ভারত রেকর্ড কোম্পানি, রিগাল, শাহেনসা রেকর্ড কোম্পানি, মেলোডি, সেনোল প্রভৃতি অন্তর্ভুক্ত। এই সেনোল কোম্পানির প্রথম রেকর্ড করেন সংগীতপ্রবর সন্তোষ সেনগুপ্ত।

যৎকিঞ্চিৎ বিভ্রান্তিও যে চোখে পড়েনি এমন নয়। এখানে উল্লেখিত— হেমন্ত মুখনিঃসৃত আলাপ-চারণায়: আমার জন্ম বাংলা ১৩২৬ সালে মাঘ মাসে— সরস্বতী পুজোর দিন। জন্মেছি বেনারসে মামাবাড়িতেই। কিন্তু সর্বজনবিদিত ও সর্বসম্মত— হেমন্তবাবুর জন্মদিন ১৯২০ সালের ১৬ ই জুন; তা কখনই বাংলার মাঘ মাস নয়। কিন্তু এক্ষেত্রে সবসময় প্রতি-প্রতিপাদন সম্ভব হয় না বা কাঁচি চালানো সংকলকের স্পর্ধার বাইরে।

এছাড়া বানান নিয়েও কিছু অসংগতি থেকে গেল। তখনকার বানান পদ্ধতির সঙ্গে এখনকার পদ্ধতির সমতা রাখতে গিয়ে কিছু অনিচ্ছাকৃত ভুল থেকে গেল। সংকলনটিতে সাধু-চলিত মিশ্রণ ইচ্ছাকৃত ত্রুটি নয়; বসুমতী পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল যেভাবে— সেভাবেই বিধৃত। এই সংকলনের শিল্পীদের আলোকচিত্র একটি সম্পদ। পত্রিকা থেকে প্রাপ্ত আলোকচিত্রগুলি প্রাধান্য পেয়েছে। শুধুমাত্র দক্ষিণামোহন ঠাকুর, শচীন গুপ্ত, রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায়, সুজিত নাগ, প্যারিকৃষ্ণ পাল, শ্রীপ্রহ্লাদ দাস প্রমুখের আলোকচিত্র জোগাড় করা সম্ভব হয়নি।

সংকলন আসলে উদ্ধারকার্য। পুরনো নথিপত্র ঘেঁটে মণিমুক্তা অন্বেষণ— আর কিছুই নয়। সেখানে সংকলকের ভূমিকা নেহাতই মামুলি। বন্ধু গবেষক সৌম্য বসুকে অশেষ ধন্যবাদ। তিনিই প্রথম লেখাগুলির প্রতি সম্পর্ক ঘটান এবং ক্ষেত্রবিশেষে পরামর্শও দিয়েছেন। প্রচ্ছদশিল্পী সুব্রত রায়ের প্রতি কৃতজ্ঞতা। অনুজ প্রকাশক বিকাশকে ভালোবাসা ও শুভেচ্ছা। ড. বিধানচন্দ্র রায় গ্রন্থাগারের অবদান অনস্বীকার্য। সবশেষে পাঠকের গ্রহণযোগ্যতার অপেক্ষায় রইলাম। নমস্কার।

সুজয় ঘোষ

## স্মৃতিচারণে যাঁরা—


মালবিকা রায় ১৫

শ্রীজয়কৃষ্ণ সান্যাল ১৭

শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯

শ্রীপঙ্কজ মল্লিক ২৪

গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ২৮

উদয়শঙ্কর ৩২

ওস্তাদ আলাউদ্দিন খাঁ ৩৬

শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র দে ৪৪

রাইচাঁদ বড়াল ৪৭

উৎপলা সেন ৫০

সত্য চৌধুরী ৫৩

শ্রীরাজেন সরকার ৫৭

সংগীতাচার্য শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় ৬০

সন্তোষ সেনগুপ্ত ৬৩

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য্য (বেনারস) ৬৭

অনুপম ঘটক ৭১

গোপেন মল্লিক ৭৫

সুনীল বসু (আকাশবাণী, কলকাতা) ৭৮

হেমন্ত মুখোপাধ্যায় ৮১

গোপাল দাশগুপ্ত (আকাশবাণী কলকাতা) ৮৫

দক্ষিণামোহন ঠাকুর ৮৮
শ্রীরাধিকামোহন মৈত্র ৯১
ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য ৯৪
ধীরেন্দ্রচন্দ্র মিত্র ৯৭
অনিল বাগচী ১০১
শান্তিদেব ঘোষ ১০৫
সত্যজিৎ মজুমদার ১০৯
গৌরীকেদার ভট্টাচার্য ১১২
শ্রীমতী সুপ্রীতি ঘোষ ১১৪
প্রতাপনারায়ণ মিত্র ১১৭
দুর্গা সেন ১১৯
শ্রীশ্যাম গঙ্গোপাধ্যায় ১২২
শ্রীপ্যারিকৃষ্ণ পাল ১২৪
সুজিত নাথ ১২৬
কাজী অনিরুদ্ধ ১২৮

শ্রীমতী সুচিত্রা মিত্র ১৩১
শ্রীহীরেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় ১৩৩
শ্রীমণীন্দ্রমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৬
গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায় ১৩৯
শ্রীমতী কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪১
শ্রীমতী মীরা বন্দ্যোপাধ্যায় ১৪৪
শ্রীসতীনাথ মুখোপাধ্যায় ১৪৭
শ্রীরত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় ১৫০
শ্রীতিমিরবরণ ভট্টাচার্য্য ১৫৩
শ্রীশচীন গুপ্ত ১৫৭
ওস্তাদ মুস্তাক আলি খাঁ ১৬০
শ্রীভীষ্মদেব চট্টোপাধ্যায় ১৬৩
শ্রীকালোবরণ দাস ১৬৭
ডক্টর শ্রীগোবিন্দগোপাল মুখোপাধ্যায় ১৭১
শ্রীপ্রহ্লাদ দাস ১৭৪

# মালবিকা রায়

লক্ষ্ণৌ-এ আমার জন্ম— ১৯৩০ সালের ডিসেম্বরে। ছোটোবেলা থেকে সংগীতময় পরিবেশের মধ্যেই বড়ো হয়েছি, বহু গুণী সংগীতজ্ঞ ও সাহিত্যিক পরিবারে, সাহিত্য ও সংগীতের প্রতি যে স্বাভাবিক অনুরাগ নিয়ে আমি জন্মেছিলাম তা যথা নিয়মে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবার পথে কোনো অন্তরায় ছিল না।

আমার মনে পড়ে না, কবে আমি আমার সংগীত শিক্ষার প্রথম পাঠ গ্রহণ করি। নিতান্ত শিশুকাল থেকেই আমার সংগীত সাধনার শুরু— আমার জ্ঞানোন্মেষের আগে থেকে। আমি আমার পিতৃদেব শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রলাল রায়ের কাছেই সংগীত শিক্ষা করেছি। তিনি পণ্ডিত ভাতখণ্ডের শিষ্য এবং ভাতখণ্ডেজীর ভাবধারার প্রকৃত অনুগামী হলেও বর্তমানে ভাতখণ্ডে সংগীত-পদ্ধতি বলতে যা বোঝায় তার থেকে তাঁর শিক্ষাদান প্রণালী স্বতন্ত্র। তাঁর কাছে আমি বিশেষ রূপে আলাপ, ধামার ও খেয়াল শিখেছি, ঠুংরি তিনি আমায় পরে শিখিয়েছেন। এছাড়া আমার স্বরচিত সুরের ভজনগুলিও আমার গাইতে ভালোই লাগে। খেয়ালও কিছু রচনা করেছি এবং সেগুলি রেডিয়োতে ও জলসায় পরিবেশনও করেছি।

আগ্রা ঘরানার গায়কির সঙ্গে আমার গায়কির মিল আছে। আগ্রা ঘরানার কিছু দুষ্প্রাপ্য রচনাও (গান) পাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়েছে। আমি ১৯৪৬ সালে কলিকাতা বেতারকেন্দ্রের শিল্পীরূপে প্রথম বাইরে গাইতে আরম্ভ করি, তখন আমার ১৫ বৎসর বয়েস।